Website: https://www.parthasarathipatrika.com

:: ২২ তম অন্তর্জাল সংখ্যা ::

১০ই মাঘ, ১৪২৮ ⁄ 24.01.2022

-: সম্পাদক :-

সুনন্দ ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি-কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
দিব্য বিজয়	শ্রী অরবিন্দ
অহমিকা	শ্রী অনিলবরণ রায়
ধর্ম ও ঈশ্বরাস্তিত্বে যুগসংশয় ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ	স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
সাইবাবার অলৌকিকত্ব	ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য
নমনীয়তা	শ্রী দীপঙ্কর নন্দী
ভেসে যাওয়া	শ্রী প্রকাশ অধিকারী
অমরত্ব	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.
Website: https://www.parthasarathipatrika.com
Contact: 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

DO NOT COPY

(10.03.1926 - 24.11.1986)

প্রীতি কণা

"শ্রদ্ধা ধৈর্য ঐকান্তিকতা থাকলে এবং নিজের কর্তব্যবোধে প্রেম ও শ্রদ্ধা রাখলে মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে।"

DO NOT COPY

(15.10.1936 – 24.10.2019)

স্মৃতিচারণ **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

আগামী ২৬শে ফাল্গুন শ্রীপ্রীতিকুমারের জন্মদিন। তিনি দেহ রাখার পর এবার তাঁর তৃতীয় জন্মদিবস পালন। আমরা কখনও ভাবি না তিনি আমাদের মাঝে নেই। তিনি আছেন আমাদের প্রতিদিনের ধ্যান ধারণার মধ্যে, কাজ কর্মের মধ্যে, ভাবনা চিন্তার মধ্যে। তাঁকে বাদ দিয়ে আমাদের চলেনি, চলেনা। চলবে না। এই আড়াই বছর আমাদের একটি কষ্টই হয়েছে, সেটা হচ্ছে তাঁকে স্পর্শ করতে না পারার ব্যথা। এখন বুঝতে পারি একটি মানুষের দৈহিক উপস্থিতির কত প্রয়োজনীয়তা। একজন সৎ-উদার ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে থাকবার কত উপকারিতা। আমরা সত্যি বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছি।

তবে একথা সত্যি আমি আজকাল এই নিঃসঙ্গতা খুব পছন্দ করি। আমার মাঝে মাঝে খুব একা থাকতে ভাল লাগে।

গত মাঘ সংখ্যায় আমি "পার্থসারথি" পত্রিকায় কিছু লিখিনি। ইচ্ছে করেই লিখিনি, না লেখার ফলশ্রুতিটা লক্ষ্য করার জন্য। অনেক অনুযোগ, অভিযোগ আমার প্রতি বর্ষিত হল কিছু পাঠকের কাছ থেকে। তাঁরা প্রায় সকলেই শ্রীপ্রীতিকুমারের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক। অনেকে বলেন, "আমরা প্রথমেই উপন্যাসটির পৃষ্ঠা খুলে বসি।"

এবারের প্রসঙ্গ আমার গুরুকরণ।

১৯৬৫-৬৬ সালে আমার দীক্ষা নেবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। প্রায়ই শ্রীপ্রীতিকুমারের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করতাম কার কাছে দীক্ষা নেব জানবার

জন্য। আমাদের ছেলে বাপী যখন খুব ছোট তখন তার কঠিন অসুখ হয়, বাঁচবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তার নিরাময় কামনা করে আমি মানসিক করেছিলাম তাকে ওজন করে বাতাসা হরির লুট দেব। নানা ঝঞ্ঝাটে আর সে মানসিক সময় মত পূরণ করা যায়নি। বরানগরের বাড়িতে এসে যখন স্থিত হয়ে বসলাম তখন হরির লুট দেব ঠিক হল। সেই সময় আমরা প্রায়ই বরানগর পাঠবাড়িতে যেতাম। ওখানে তখন প্রধান ছিলেন শ্রী জীবন দাস বাবাজী। তিনি সব ব্যবস্থা করে দিলেন। বাপীর তখন ওজন প্রায় ২০ কেজি। অত বাতাসা হরির লুট দেবার সময়ে শ্রী জীবন দাস বাবাজী অপূর্ব কন্ঠে কীর্ত্তন করেছিলেন। সে যে কি মনোমুগ্ধকর অপূর্ব দরাজ গলা চিন্তা করা যায়না। তারপর থেকে তিনিও আমাদের খুব পাঠবাড়িতে যেতে বলতেন। আমি ও শ্রীপ্রীতিকুমার প্রায়দিনই সন্ধ্যাবেলায় পাঠবাড়িতে যেতাম।

একদিন শ্রীপ্রীতিকুমার আমাকে বলেছিলেন, "যদি তোমার দীক্ষা নিতে হয় তুমি জীবন দাস বাবাজী নয়ত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সভাপতি স্বামী সচ্চিদানন্দ মহারাজের কাছে দীক্ষা নিতে পার।" সদগুরু হবার যা কিছু লক্ষণ এঁদের মধ্যে আছে।" আমি জীবন দাস বাবাজীর কাছে যাই। তাঁর গান শুনি, তাঁর সাথে গল্প করি। তিনি নিজে আমাকে দীক্ষা নিতে বলেন। আমি জবাব দিতাম, "আমার স্বামীর কাছে দীক্ষা নেব।" উনি বলতেন, "স্বামীর কাছে দীক্ষা নিবি কিরে! রাগ হলে স্বামীকে বকিস, স্বামীর গায়ে পা লাগতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি .....। ঈশ্বরের কাছে যেতে হলে মাধ্যম লাগে। গুরুই সেই মাধ্যম। তোর এবার মন্ত্র নেওয়া দরকার ...।" প্রায় মনস্থির করে ফেলেছিলাম – বৈষ্ণব হলে মাছ, মাংস খাওয়া যাবে না, গলায় কন্ঠি যদি লাগাতে হয় এরকম একটা ভয়ও ছিল। একদিন সকালে পাঠবাড়িতে গেছি। পনেরো মিনিটের মধ্যে পি. টি. ঊষার চেয়ে দ্রুততর বেগে বাড়িতে। শ্রীপ্রীতিকুমার অবাক হয়ে বললেন, "কি হল? ফিরে এলে যে?" বললাম, "দেখলাম জীবন দাস বাবাজী একটা চেয়ারে বসে আছেন, তিন চারজন মহিলা তাঁকে তেল মাখাচ্ছেন, স্নানের জন্য তৈরি করছেন। আমার যদি আবার সেবা করতে হয় – তাই পালিয়ে এলাম।" তারপর আর ওমুখো হইনি। আসলে তখন আমার বয়স কম ছিল, বুদ্ধিতো ছিলই না। গুরুকে সেবা করবার ভাবটা যে স্বতঃস্ফূর্ত, সেটা আজ বুঝি। ওতে গুরুর কোন দায় থাকে না। আজ যদি তিনি থাকতেন হয়ত আমি তাঁকে সেবা করে ধন্য হতাম।

এরপর শ্রীপ্রীতিকুমার একটি দিন স্থির করে দীক্ষা নেবার জন্য ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে চিঠি লিখলেন। তাঁরা বোধহয় শিবরাত্রি বা ঐ রকম সময়ে আমাকে দীক্ষা নেবার জন্য যেতে বললেন। নির্দ্দিষ্ট সেই দিনে কেন জানিনা আমার যেতে ইচ্ছা করল না। দুদিন পরই সুরথ মহারাজ (স্বামী কৈবল্যানন্দ) শ্রীপ্রীতিকুমারকে চিঠি লিখলেন। "আপনার স্ত্রী ঐদিন এলেন না কেন?" নিজের স্ত্রীর যে মতের ঠিক নেই এটা আর শ্রীপ্রীতিকুমার তাঁদের জানান নি, আমাকেও তিরস্কার করেন নি।"

তারপর গুরুকরণের ইচ্ছেটা আমার মাথা থেকে চলে গেলো। তখন আমার মাথায় "পর্বতারোহণ" শব্দটি প্রবেশ করেছে। আমি তখন মাউন্টেনীয়ারিং, ট্রেকিং, মানালী, দার্জিলিং, সুজয়া গুহ, পথিকৃৎ ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি।

শ্রীপ্রীতিকুমার অধ্যাত্ম মার্গের পথিক হওয়ায় বিভিন্ন আশ্রম, সম্মেলনে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। আমাদের বাড়িতে এলেন স্বামী শিবানন্দ গিরি। অপূর্ব গলায় গান গাইতেন। কথা বলতেন থেমে থেমে। কিন্তু তিনি আমাকে এমন বউদি সম্বন্ধের মধ্যে আবদ্ধ রাখলেন আমার আর দীক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ হল না।

দীক্ষা নেবার চিন্তাটা আমার মাথায় নিয়মিত ভাবে আর ছিল না। মাঝে মাঝে তাঁকে বলতাম "এঁর কাছে দীক্ষা নেব, ওঁর কাছে দীক্ষা নেব, বেশ সারা বছর Foreign এ থাকবো, সারা বছর গান গাইব ইত্যাদি ইত্যাদি।" তিনি শুধু হাসতেন, আর কখনও বলতেন না, "না।"

এর মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। ১৯৮৬-র ২৪শে নভেম্বর শ্রীপ্রীতিকুমারের আকস্মিক প্রয়াণ। এই পঞ্চাশ বছর পর আমি নিজের জীবনের দিকে তাকালাম, সংসারের দিকে তাকালাম, পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে শুরু করলাম। জীবনে ভাবিনি ঈশ্বর কে, কি কেন ... সেই আমি অকূল পাথারে পড়লাম। ... একদিন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বিবিদিষানন্দ এলেন দমদমের বাড়িতে। তাঁর সাথে আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক। আমার শ্বশুরালয়ে প্রবেশকালীন প্রায় সমবয়সী বন্ধু সে। সংসার ত্যাগী, গেরুয়া বসনধারী সন্ন্যাসী হলেও আমি তাঁকে আমার সেই বন্ধুই মনে করি। শ্রীপ্রীতিকুমার তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি একদিন এসে খবর দিয়েছিলেন উচ্ছ্বসিত হয়ে, "জান, রাধেশ্যামের সাথে দেখা হয়েছে কাশীতে।" রাধেশ্যাম তাঁর থেকে অনেক ছোট, কিন্তু সে সন্ন্যাসী, তাই বাড়ীতে এলে কি সমাদরেই না সন্ন্যাসী সেবা করতে বলতেন। সেই দিনগুলি কি ভোলা যায়? খবরের কাগজে খবরটি পেয়ে স্বামী

বিবিদিষানন্দ এলেন। কি একটি কথায় বললেন – "আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমাকে এপথে কে এনেছেন।" শ্রীপ্রীতিকুমার বলতেন, "তুমি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে টাকা দিয়ে যেও। ওদের Relief-এর জন্য অনেক টাকা দরকার।" একে শ্রীপ্রীতিকুমারের সমর্থন, তায় স্বামী বিবিদিষানন্দ – মোটামুটি আমার মনে পড়ে গেল কুড়ি বছর আগেকার সেই দীক্ষা নেবার নির্দেশ। স্বামী বিবিদিষানন্দ বললেন, "সময় হলেই হবে।"

মাঝে মাঝে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে যাই। পুরীতে রথযাত্রায় ক'দিন ওখানে রইলাম। ফিরে এসে গুরুপূর্ণিমা। স্বামী বিবিদিষানন্দের সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি আমাকে বড় মহারাজের দর্শনে পাঠালেন। দীর্ঘ লাইন দিয়ে তাঁর দর্শন পেলাম। কিন্তু এ কোন স্বামী সচ্চিদানন্দ? অসুস্থ, শয্যাশায়ী, পা দুটি ঢাকা। চরণ স্পর্শ করলাম। ভিতরে কেমন যেন শিহরণ, ভয়। শ্রীপ্রীতিকুমার দুজন সাধকের কাছে দীক্ষা নিতে বলেছিলেন। জীবন দাস বাবাজী কবেই দেহ রেখেছেন। এখন স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজের যদি কিছু হয়? মাথার মধ্যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এঁর কাছে দীক্ষা না নিলে আর আমি গুরু কোথায় পাব? আবার গেলাম পরের রবিবার। বড় মহারাজ তখন গান করবার জন্য বিবিদিষানন্দজীকে তাঁর ঘরে ডেকেছেন। অপেক্ষা করছিলাম। তিনি বেরিয়ে এসে আমাকে বললেন, "সামনের বুধবার সকাল আটটার মধ্যে চলে আসবেন।" কি কি করতে হবে নির্দেশ দিলেন। বাড়ি ফিরে ছেলের মুখোমুখি। তর্ক বিতর্ক। তার বাবার অস্তিত্ব বিপন্ন মনে করেছিল কিনা জানিনা। আমি তাকে বোঝালাম, তোর বাবাই তো আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছে হলে হবে, না হলে, নয়। পারলে তোমার বাবা বাধা দেবেন। আমি তাকে বোঝাতে চাইছিলাম ওসব দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শনে আমি বিশ্বাসী নই। আমি জানতে চাই দীক্ষা কি? কেমন সে পদ্ধতি ইত্যাদি। শ্রীপ্রীতিকুমার ছিলেন আমার জীবনের "পরমপুরুষ।" এই দীক্ষার্থে কোন মন্ত্র আমি তাঁর কাছে নিই নি। তাছাড়া, তিনি যখন আমাকে স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজের কাছে দীক্ষা নিতে বলেছিলেন – আমি সেকথা পালন করবই।

যাইহোক, সেটি ছিল আগষ্ট মাস। শ্রীমান কিশোর কোন কারণ না জেনেই আমাকে আটটার মধ্যে পৌঁছতে সাহায্য করল রাসবিহারী এভেন্যুতে। ট্যাক্সি থেকে নেমেই একছুট। স্বামী বিবিদিষানন্দজী জিজ্ঞেস করলেন, "বাপী আসেনি? আজকে তো তার আসাটা ভালো হতো। জবাব দিলাম কি দিলাম না, সেটা আর খেয়াল নেই। অপেক্ষা করবার পর সেই ঘরে প্রবেশ করবার সময়

এল। ওমা! একি অবাক কাণ্ড! দুদিন আগে যাঁকে উত্থানশক্তিরহিত দেখে গেছি, তিনি সুন্দর বসে আছেন! আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি মন্ত্র পছন্দ করো মা? শিবমন্ত্র, কৃষ্ণমন্ত্র না কালীমন্ত্র?" আমি বললাম, "শিব ঠাকুরকে আমার বড় পছন্দ। আমি রোজ তাঁকেই স্মরণ করি। আমি রোজ 'নমঃ শিবায় নমঃ' বলে প্রণাম করি।" তিনি আমাকে একটি মন্ত্র উচ্চারণ করতে বললেন। নিজেই বললেন, "লিখে দেব মা?" আমার কি আনন্দ! হাতের লেখাটিতো পাব। আমি সমর্থন জানাতে একটি কাগজে নিজ হাতে লিখে দিলেন। আমাকে আশীর্বাদ করলেন। ঘর থেকে যখন বেরিয়ে এলাম তখন মনটা শান্ত তৃপ্ত। অনেকদিনের সাধ যেন পূরণ হল।

সেই আমার স্বামী সচ্চিদানন্দজীর সাথে শেষ দেখা। পরে একদিন সঙ্ঘে গেছিলাম। স্বামী বিবিদিষানন্দজী তাঁর একটু আগেই কুম্ভমেলার প্রস্তুতির জন্য এলাহাবাদ রওনা হয়ে গেছেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল বলে আর বড় মহারাজের ঘরে গেলাম না – গেলে হয়ত শেষ দেখাটা হত।

আসলে আমরা সবসময় পরিকল্পনা করে কাজ করি না, করলে হয়ত আফশোষগুলি করতে হতো না। স্বামী হিসেবে যাঁকে পেয়েছিলাম সেই শ্রীপ্রীতিকুমারকে আমি কারও সাথে মেলাতে পারিনা। অমন সৌন্দর্য্য, অমন চারিত্রিক মাধুর্য্য আমি একসাথে কারও মধ্যে দেখেছি বলে মনে করতে পারি না। তিনি জীবিতাবস্থায় তাঁর অবাধ্য হয়েছি, তর্ক করেছি, বাচালতা করেছি – কিন্তু এখন আমি তাঁকেই সবচেয়ে মান্য করি। আমাকে যা যা বলেছিলেন সেগুলি মেনে চলবার চেষ্টা করি। বারবার বলতেন, "আসক্তিকে জয় করো।" এই আসক্তি জয় করতে পারলে আর কেউ আমাকে ছোট করতে পারবে না, উপকার করবার নাম করে দুটো উপদেশ দিতে পারবে না, সেই দিনটির অপেক্ষাতেই আছি। এই মুহূর্তে এই পৃথিবীটা ছেড়ে যাবার ইচ্ছে আমার একটুও নেই। আমার একটি প্রার্থনা ছিল, "আমি সব দেখে যেতে চাই।" আমার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, "তুমি সব দেখে যাবে।"

আমি অপেক্ষা করে আছি।

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(** রচনাকাল - ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯)

যা কিছু সত্যসঙ্গত এবং প্রত্যেক বস্তুর নীতিসঙ্গত, যা কিছু মানুষের মধ্যে ভালবাসা প্রীতি বর্দ্ধিত করে, যা কিছু ব্যক্তিগত, জাতিগত এবং দেশগত শক্তি বর্দ্ধিত করে তাহাই দিব্য। আমাদের স্নেহ ভালবাসা আমাদিকে দুর্বল, অন্ধ বা অবিবেকী যেন না করে, আমাদের শক্তি যেন আমাদিকে নির্দয় বা ভয়ঙ্কর করে না তোলে; আমাদের নীতি যেন আমাদিকে বাতুল বা ভাবপ্রবণ করে না দেয়। ধীর স্থিরভাবে, ধৈর্য সহকারে, নিরপেক্ষতার সহিত আমরা চিন্তা করবো; আমরা ভালবাসবো সর্বান্তঃকরণে, গভীরভাবে, কিন্তু বিজ্ঞতার সহিত। আমরা কাজ করব সবলে, মহানুভবতার সহিত শক্তি প্রয়োগে। এর পরও যদি আমরা ভুল করি, ভগবান তো কোনো ভুল করবেন না। বিচার করে আমরা কাজ করব। ফলাফল ভগবানের হাতে। তিনি যা করেন, তা মঙ্গলের জন্যই করেন।

অধিকাংশ মানুষই চালিত হয় পশুর ন্যায় প্রকৃতির শক্তির দ্বারা। যে কোন বাসনারই উদ্রেক হয়, তারা তা পূর্ণ করতে প্রয়াস করে, যে কোন ভাবেরই উদয় হয় তারা তার বশে কাজ করে, যে সব বস্তুর অভাব তাদের আছে, তারা সে সব পাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু মানুষের একটি মনও আছে, এবং যতই সে পূর্ণতা অর্জন করে ততই সে শেখে তার যুক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি দিয়ে প্রাণিক এবং দৈহিক প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে। কিন্তু উহা নিতান্তই আংশিক নিয়ন্ত্রণ। কারণ মনের যুক্তি প্রায়ই বিভ্রান্ত হয় প্রাণের বাসনায়, এবং দেহের অজ্ঞতায়। মন তার ধারণা, যুক্তি ও তর্কবুদ্ধির সাহায্যে দেহ ও প্রাণের ভুল ও অন্যায় কার্যের সাহায্য করে, তাদিকে সমর্থন করে। যদিও বা মনের যুক্তি মুক্ত থাকে, এবং মন যদি প্রাণ বা দেহকে বলে, "ইহা করোনা" – তথাপি প্রাণ ও দেহ নিজ নিজ প্রবৃত্তি নিয়ে চলে এবং মনের বাধাকে অগ্রাহ্য করে। মানুষের মানসিক সঙ্কল্প প্রাণ বা দেহকে বাধ্য করতে পারেনা।

শুধু প্রাণ বা দেহই নয়, মানুষের মনকে সচেতন হতে হবে দিব্য সত্য সম্বন্ধে এবং মেনে নিতে হবে দিব্য বিধান।

পরম প্রভুর নিখুঁৎ যন্ত্র হওয়ার অপেক্ষা গরবের বা গৌরবের আর কিছুই নাই। প্রথমে শিখতে হবে একান্ত ভাবে বাধ্য হতে। তরবারি নিজে পছন্দ করেনা কোথায় সে আঘাত করবে, শর জানতে চায় না কোথায় তাকে নিক্ষেপ করা হবে, যন্ত্রের কলকব্জা ঝোঁক ধরে না কোন বিশেষ বস্তু প্রস্তুত করতে, –

তাদিকে চালিত করা হয়। কর্তব্য কর্ম নির্দ্ধারিত করা হয় প্রকৃতির অভিপ্রায় এবং কর্ম পদ্ধতি অনুসারে। সচেতন যন্ত্র যতই তার নিজস্ব প্রকৃতির মূল এবং অবিমিশ্র বিধানগুলি জেনে তা সব মেনে চলতে শিখবে ততই তার দ্বারা যে সব সাধিত হবে তা সম্পূর্ণ এবং দোষ ত্রুটি শূন্য হবে।

ঝড়ের মুখে কুটোর মতন ভগবানের ফুৎকারে চালিত হও। তাঁর হাতে নিজেকে সমর্পণ কর, হয়ে যাও তলোয়ারের মতন যা আঘাত করে, তীরের মতন যা লক্ষ্য ভেদ করে। তোমার মন হোক যন্ত্রের স্প্রিংয়ের মতন, তোমার শক্তি হোক যন্ত্রের সঞ্চালন, তোমার কাজ হোক ইস্পাতের ঘর্ষণে দ্রব্য গঠনের মতন। তোমার বাক্য হোক নেহাইয়ের উপর হাতুড়ির আঘাতের শব্দের মতন, কর্মে রত ইঞ্জিনের রণনের মতন, শিঙ্গার ধ্বনির মতন, যা দিকে দিকে ঘোষণা করে ভগবানের পরাক্রম। যেভাবেই হোক না কেন তোমার প্রকৃতি অনুযায়ী যে কর্মে তুমি নিযুক্ত হয়েছ তা যন্ত্রবৎ করে যাও।

যুদ্ধের খেলায় তরবারির আনন্দ আছে, শর আনন্দ পায় যখন সে শন্ শন্ শব্দে লক্ষ্যের পানে ছুটে যায়, পৃথিবী উৎফুল্লিতা হয় বিপুল বেগে শূন্যপথে ঘূর্ণায়মান হয়ে, সূর্যের আছে রাজকীয় আনন্দ তার প্রদীপ্ত ঐশ্বর্যে এবং তার নিরন্তর গতিতে। তুমিও সচেতন যন্ত্র হয়ে যাও, তুমিও তোমার নিজস্ব নিয়োজিত কর্ম আনন্দের সাথে করে যাও।

তরবারি দাবী করে নাই তাকে প্রস্তুত করতে, তার ব্যবহারেও সে বাধা দেয় না, ভগ্ন হলেও সে শোক প্রকাশ করে না। নির্মিত হওয়ার আনন্দ আছে, ব্যবহৃত হওয়ারও আনন্দ আছে, অব্যবহৃত হয়ে একপাশে পড়ে থাকারও আনন্দ আছে এবং ভগ্ন হওয়ারও আনন্দ আছে। ঐ নিরপেক্ষ আনন্দ সম্বন্ধে সচেতন হও।

আমরা বৃহত্তম ব্যক্তিই হই বা ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিই হই, আমাদের শক্তি আমাদের নিজস্ব শক্তি নয়, পরন্তু ঐ শক্তি আমাদিকে দেওয়া হয়েছে যে খেলা আমাদিকে খেলতে হবে, যে কাজ আমাদিকে করতে হবে তার জন্য। শক্তি হয়ত আমাদের মধ্যেই নির্মিত হচ্ছে, কিন্তু ইহার বর্তমান গঠনই শক্তির পরাকাষ্ঠা নয়। আমাদের দিব্য শক্তি এখনও তার চরম অবস্থায় ওঠে নাই, এবং আমাদের দুর্বলতাই এই শক্তির শেষ নিদর্শন নয়। যে কোন মুহূর্তেই এই গঠনের পরিবর্তন হতে পারে। যে কোন মুহূর্তেই যোগের প্রভাবে, আমাদের দুর্বলতা পরিবর্তিত হতে পারে শক্তিতে, অক্ষম হতে পারে সক্ষম। অকস্মাৎ অথবা ধীরে ধীরে আমাদের যান্ত্রিক চেতনা উর্দ্ধে উত্থিত হয়ে নূতন রূপ গ্রহণ করতে পারে, অথবা

তার সুপ্ত শক্তি সমূহকে জাগ্রত এবং বর্দ্ধিত করতে পারে। আমাদের উর্ধে, আমাদের অন্তরে, চারিদিক থেকেই আমাদিকে আবৃত করে রয়েছে সর্বশক্তি। এই শক্তির উপরেই আমাদিকে নির্ভর করতে হবে আমাদের কাজের জন্য, উন্নতির জন্য, আমাদের রূপান্তরকারী পরিবর্তনের জন্য। আমাদের কাজের উপর শ্রদ্ধা নিয়ে যদি আমরা অগ্রসর হই, আমরা যে এই কাজের যন্ত্রস্বরূপ এই বিশ্বাসে, এবং যে শক্তি আমাদিকে কাজে নিযুক্ত করেছে তার উপর আস্থা রেখে, তাহলে দুরুহ অবস্থার মধ্যেই, বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে এবং সে সব অতিক্রম করার সময়, আমাদের সক্ষমতায় বা অক্ষমতায় ঐ দিব্যশক্তি আমাদের কাছে আসে। আমাদের যতখানি প্রয়োজন ততখানি শক্তিই আমরা ধারণ করি, এবং অধিকতর রূপে দিব্য শক্তির নিখুঁত যন্ত্র হয়ে উঠি।

অহমিকা **শ্রী অনিলবরণ রায়**

ইহা একটি বিচিত্র ব্যাপার কেমন করে অহমিকা মিশ্রিত হয়ে থাকে আমাদের আত্মসমর্পণের সঙ্গে, এমনকি যখন এই আত্মসমর্পণ বাহ্যত সততা এবং আন্তরিকতায় পূর্ণ থাকে। এক এক সময় আমরা সর্বান্তঃকরণে ভগবানের কাছে নতমস্তক হই, অন্য সব সময়ে আমরা আমাদের নিজস্ব মতে চলি। আবার একই সময়ে আমাদের সত্তার কতকগুলি অংশ ভগবানে আত্মসমর্পণ করে আর অন্য সব অংশগুলি দূরে সরে থাকে। শান্তি এবং সমতার অভাব তাই হয়, কারণ প্রকৃত এবং সমগ্র আত্মসমর্পণ যেখানে থাকে সেখানে অশান্তি এবং অসমতা থাকতে পারে না।

ভগবানের উপর আমরা আস্থা রাখি, আবার আপনাদের নিজস্ব শক্তির উপরও আমরা নির্ভর করি। যেমন বলা হয় – "আমরা ভগবানের সাহায্যের উপর নির্ভর করি, তথাপি আমাদের বন্দুকের বারুদও শুষ্ক রাখি।" অর্থাৎ আমাদের আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্য শুধু ভগবানের কাছ থেকে যতখানি সাহায্য পাওয়া যায় তা নিয়ে নিজেদের কাজে সুবিধা মতন প্রয়োগ করা, আমাদের আত্মসমর্পণের এই যে অসম্পূর্ণতা এবং কৃত্রিমতা তাহাই আমাদের মধ্যে দিব্য–শক্তির কাজের পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি করে।

DO NOT COPY

হে দিব্য জননী, এই মিথ্যাচার এই দ্বিরাচার যেন সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয় আমার অন্তর থেকে। আমি যেন সর্বদা তোমারই অভিমুখী হই। সকল অহমিকা সকল আত্মজনিত উপক্রম সকল বাসনা থেকে আমি যেন মুক্ত থাকি। এই আন্তরিক প্রার্থনা যেন আমার ভিতর থেকে নিয়ত উত্থিত হয়।

হে দিব্য জননী! তোমার দিব্য মহিমার সাথে তুমি আমার মধ্যে অবতরণ কর; আমার ইচ্ছাশক্তিকে গ্রহণ করে তাকে তোমার দিব্য প্রেমের নিখুঁৎ আনন্দাধার করে তোল।

সর্বভূতের যিনি অব্যয় অক্ষয় পরমাত্মা তাঁর মধ্যে আমাদের অহমিকাত্মক ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে আমরা প্রকৃতপক্ষে কিছুই হারাই না। অহমিকার দ্বারা আমরা অজ্ঞান ভাবে এই জগতের একটি সীমাবদ্ধ অংশে বন্দী থাকি। অহমিকার উপরে উঠে আমরা ঐ সীমা ত্যাগ করে যাই এবং সমগ্র জগতকেই আপনার মনে হয়।

তখন আর আমাদের প্রিয়জন এবং আত্মীয় স্বজনের বিরহ বিচ্ছেদ আমাদিকে সহ্য করতে হবে না। সকলকেই তখন পাব আমাদের নিজস্ব আত্মার মধ্যে এবং জগতের সকল জীবই একইভাবে আমাদের নিকট আত্মীয় এবং প্রিয় হবে। আমাদের বাধ্যবাধকতা এবং কর্তব্যবোধ তখন আর আমাদিকে বিব্রত করবে না, কারণ, তখন উপলব্ধি করবো যে আমরা প্রকৃতই কোন কাজ করিনা, বিশ্বপ্রকৃতিই আমাদের সকল কার্য সমাধা করে। এই জগতের সুখ দুঃখ তখন আর আমাদিকে স্পর্শ করতে পারবে না, কারণ আমরা দেখব যে সে সবই এই বিশ্বলীলার প্রবহমান দৃশ্য মাত্র। আমরা উপলব্ধি করব যে আমাদের প্রকৃত আত্মা অনন্ত এবং সর্বাঙ্গসুন্দর, তখন আমরা সব তুচ্ছ বাসনা আর আসক্তির উপরে উঠব। আমাদের অহমিকাকে হারিয়ে আমরা কেবলমাত্র আমাদের বন্ধন এবং সংকীর্ণতাই হারাই।

তথাপি আমাদের পৃথক ব্যক্তিত্ব আমরা হারাই না। আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতির মাধ্যমে আমরা দিব্য জননীর সহিত ভালবাসার এবং ভক্তির সম্বন্ধ স্থাপন করি, এবং আমরা দেখি আমাদের প্রকৃতি তাঁরই অংশ, জগজ্জননীর দিব্য লীলা প্রকাশের আমরা আধার। ভগবানের প্রীতির জন্যই দিব্য জননীর এই বিশ্বলীলার প্রকটন। আমাদের নিম্নতর সত্তাকে আমাদের উচ্চতর সত্তায় নিমজ্জিত করে এবং আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতিকে দিব্য জননীর সহিত একীভূত করেই আমরা আমাদের যথার্থ দিব্য সত্তায় বর্দ্ধিত হতে পারি।

হে দিব্য জননী, তোমার সহিত সর্বতোভাবে একীভূত না হওয়া পর্যন্ত এই অহমিকার জীবনের দুর্গতি থেকে মুক্তিলাভের অন্য কোন পন্থা নাই।

যতদিন পর্যন্ত অহমিকা আমাদের জীবনের কেন্দ্র, ততদিন অনবরত আমরা তার চারিদিকে ঘুরতে থাকি, বন্দী থাকি আমাদের অজ্ঞান প্রসূত আসক্তির বন্ধনে, চালিত হই অন্ধ বাসনার দ্বারা। ঐ অন্ধকার আর অজ্ঞানতার অবস্থায় পড়ে থাকলে কোন প্রকৃত উন্নতি বা রূপান্তর একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু যখন দিব্য জননীর মধ্যে আমরা নিমজ্জিত হই তখন নিম্নতর জীবনের সব সঙ্কীর্নতা এবং সব অপূর্ণতা সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষিত হয়।

অহমিকার স্থলে দিব্য জননী তখন আমাদের জীবনের কেন্দ্র হয়ে পড়েন। তাঁর ইচ্ছা আমাদের বাসনা কামনার স্থান অধিকার করে; আমাদের সসীম যুক্তির আলোর স্থানে তাঁর সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সকল চাওয়া, আমাদের অহমিকাত্মক সব আকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হয়ে যায় বিশ্বজননীর সহিত সমগ্রভাবে মিলনের এবং তাঁর আন্তরিক স্পর্শজনিত আনন্দের মধ্যে। উহাই আমাদের জীবনের প্রকৃত সত্য। জগজ্জননীর উপাদানেই আমরা গঠিত, তাঁরই বহ্নির আমরা স্ফুলিঙ্গ। তাঁর আর আমাদের মধ্যে পার্থক্যের সকল অনুভূতিই ভ্রমাত্মক এবং আমাদের দুর্দশার প্রকৃত কারণ।

হে বিশ্বজননী, আমি যেন অধিকতর রূপে তোমার সাথে একীভূত হয়ে যাই। আমার সকল স্বাধীন ক্রিয়া কর্ম, সব পৃথক অস্তিত্ব যেন সর্বতোভাবে শেষ হয়ে যায়। নদী যেমন সাগরে পতিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং সমুদ্রের মতনই বিশাল এবং অনন্ত হয়ে পড়ে, ঠিক সেই ভাবেই আমার মানব জীবন তোমার মধ্যে নিমজ্জিত হোক, মা, এবং তোমার দিব্য জীবন এবং দিব্য চেতনায় মহৎ ও গৌরবময় হোক।

“মানুষ যখন আত্মবিশ্বাস হারায়, তখন তার মত দুর্বল অসহায় জীব আর নেই। নিজেকে অক্ষম মনে করার মত পরাধীনতা, আত্মবঞ্চনা আর নেই। এ বন্ধন অন্তরের যা মানুষকে পঙ্গু করে দেয়। কাজেই সর্বাগ্রে এ বন্ধন থেকে মুক্তির প্রয়োজন।”

– নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

ধর্ম ও ঈশ্বরাস্তিত্বে যুগসংশয় ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ :

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (উদ্বোধন)

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাবকালে ঈশ্বরাস্তিত্বে যে সংশয় উঠেছিল, তার একটা কারণ ঈশ্বরাস্তিত্ব ভিত্তিক যে জীবন, ধর্মজীবন, তার যথার্থ রূপ জীবনে কোথাও মূর্ত দেখা যাচ্ছিল না বিপুল ভাস্বরতা নিয়ে, সকলের চোখে পড়ার মতো বিভামণ্ডিত হয়ে; বরং মানুষের ঈশ্বরবিশ্বাসকে ভাঙ্গিয়ে ধর্মকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপব্যবহার করা বেড়ে গিয়েছিল পৃথিবীর সর্বত্রই। দ্বিতীয় কারণ, বিজ্ঞানের নব নব সত্য আবিষ্কারের ফলে মানুষ যুক্তি প্রধান হয়ে উঠেছিল ক্রমশই। শাস্ত্রের বা সত্যদ্রষ্টাদের কথা তখন সে আর 'বিশ্বাস' করে নিতে পারছিল না; অথচ, আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্য ও যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে সেগুলির সত্যতা প্রমাণ করার মতোও তখন ছিল না কেউ। স্বামীজীর ভাষায়, সেটা এমন একটা সময়, 'যখন আধুনিক বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কারের মুহুর্মুহু প্রবল আঘাতে প্রাচীন আপাতদৃঢ় ও অভেদ্য ধর্মবিশ্বাসগুলির ভিত্তি পর্যন্ত চূর্ণবিচূর্ণ হইতেছে, যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতগুলি শূন্যমাত্রে পর্যবসিত হইয়া হাওয়ায় উড়িয়া যাইতেছে,' যখন পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞানীগণ 'ধর্মসম্পর্কিত সমুদয় বিষয়কে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।'

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এসে সংশয়ের পূর্বোক্ত দুটি কারণকেই নির্মূল করে দিয়েছেন - নিজ জীবনে ধর্মোক্ত সত্যগুলিকে মূর্ত করে জগতের সম্মুখে তুলে ধরে এবং সে সত্যগুলির উপর আধুনিক যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোক ফেলেই সেগুলির সত্যতাকে বুদ্ধির নিকটও স্পষ্ট করে তুলে ধরে।

যুক্তির দিক থেকে সংশয়গুলির দুচারটি মাত্র (যা এখনো জড়বাদের পক্ষ থেকে ধর্ম ও ঈশ্বরাস্তিত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবেই প্রচারিত হচ্ছে) এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কথা থেকে তার নিরসন অতি সংক্ষেপে এখানে আলোচিত হবে।

একটা কথা আগেই বলে রাখা ভাল, যুক্তি আর বিশ্বাস দুটি আলাদা জিনিষ। আর, অন্ধবিশ্বাস বলে কোনকিছু থাকতে পারে না, - হয় যুক্তি, না হয় বিশ্বাস।

এখানে আমরা আলোচনা করব তিনটি সংশয় সম্বন্ধেঃ

প্রথমঃ জগতের আরো পাঁচটা জিনিষ যেভাবে বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য আমাদের, ঈশ্বর সেরূপ নন, অন্য পাঁচটা জিনিষ যেমন দেখতে পাই আমরা, তাঁকে সেভাবে দেখা যায় না। কাজেই ঈশ্বর বলে কিছু নেই।

দ্বিতীয়ঃ আধুনিক বিজ্ঞান জগতের সৃষ্টি প্রভৃতির মূলে ঈশ্বরকে কোথাও পায় নাই, মানুষের দেহাতীত কোন সত্তারও সন্ধান পায় নাই। বিশ্বের সৃষ্টি প্রভৃতির ব্যাখ্যা, জীবনের ব্যাখ্যা সে ঈশ্বর ছাড়াই দিচ্ছে। কাজেই জগতের মূলে ঈশ্বরকে কল্পনা করার কোন প্রয়োজনই নেই। জগতের সব সমস্যার সমাধান বিজ্ঞানই করতে সমর্থ।

তৃতীয়ঃ সত্য কখনো দুরকম হতে পারে না। অথচ বিভিন্ন ধর্মে ঈশ্বর বিভিন্ন রূপে বর্ণিত। কাজেই সব ধর্মই এবং ঈশ্বর অসত্য।

প্রথমটি সম্বন্ধে শ্রী রামকৃষ্ণ সহজ কথায় বলেছেন যে, দিনে তারা দেখা যায় না বলে কি বলতে হবে তখন আকাশে তারা নেই?

আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্তাগুলিরই কয়টাকে আমরা দেখতে পাই? বিদ্যুৎ-চুম্বক-তরঙ্গ, ইলেকট্রন, প্রোটন, পরমাণু প্রভৃতির কোনটিকে আমরা দেখেছি? বস্তুর স্থূলতর রূপ, যা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়, তাওতো খালি চোখে দেখা যায় না। রক্তকে লাল রং-এর তরল পদার্থ রূপেই দেখি আমরা। তাই বলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রেই যা দেখা যায়-রক্ত প্রায় বর্ণহীন তরল পদার্থ যার ভেতর কতকগুলি লাল আর সাদা কণিকা ভেসে বেড়াচ্ছে - তা সত্য নয় বলি নাকি? না বলি, বিদ্যুৎ-চুম্বক-তরঙ্গ, ইলেকট্রন প্রভৃতি মিথ্যা? শুদ্ধ মনে যা প্রত্যক্ষ হয়, সাধারণ মনে তা প্রত্যক্ষ হচ্ছে না বলেই তাকে মিথ্যা বলি কি করে?

যুক্তির দিক থেকে এটা অতি স্থূল। (সম্প্রতি ইলেক্ট্রন-মাইক্রস্কোপের সাহায্যে অ্যাটমের ফটো তুলেছেন জনৈক বিজ্ঞানী। তাই বা কয়জন দেখেছি?)

তাছাড়া, আরো বড় কথা বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'আমি ঈশ্বরকে দেখেছি। তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়, এই যেমন তোমাকে দেখছি।' এবং 'যদি চাও, তোমাকেও দেখাতে পারি।' 'ঈশ্বরকে দেখছি'-'বেদাহম্ এতং পুরুষং মহান্তম্'- এ সত্যের অধুনাতন সমর্থন শ্রীরামকৃষ্ণ দিলেও তিনি যে একাই দেখেছেন তা নয়, তাঁর আগে হাজার হাজার সত্যদ্রষ্টা দেখেছেন, পরেও বহুজন দেখেছেন। কাজেই 'ঈশ্বরকে দেখা যায় না' এটা বলা চলে কিরূপে? যদি বলি এরকম দেখার লোক সংখ্যায় কম -যুক্তির দিক দিয়ে একথার মূল্য কি? আধুনিক সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক সত্যগুলিই বা, যা যন্ত্রসহায়ে দেখা যায়, কয়জন

দেখেছেন? দেখা তো দূরের কথা, ধারণাই বা করতে পারেন কয়জন? তাই বলে, সবার প্রত্যক্ষ নয় বলে, সেগুলিকে মিথ্যা বলতে হবে?

যদি বলি, দেখিনি সবাই, তবে ইচ্ছে করলে দেখতে পারি, একটা পদ্ধতি ধরে গেলে। সে পদ্ধতির, নিজে পরীক্ষা করে দেখার মতো প্রস্তুতির জন্য যা করতে হবে তার কথা তো বিজ্ঞানীরা ঘোষণাই করেন।

পদ্ধতি তো জোর গলায় ঘোষণা করেছেন সত্যদ্রষ্টারাও। কখনো বলছেন না আমার কথা বিশ্বাস করে নাও। বিজ্ঞানীদের মতোই বলেছেন, এভাবে গিয়ে এ সত্য আমি প্রত্যক্ষ করেছি; এভাবে যা তুমিও দেখতে পাবে।

যদি বলি, লোক ঠকাবার জন্য বাজে কথা বলেছেন তাঁরা, যাঁরা ধর্ম ও ঈশ্বরের কথা বলেন তাঁরা হলেন (আধুনিক জড়বাদী আর প্রাচীন চার্বাকবাদীর উভয়েরই ভাষায়) 'ধূর্ত ভন্ড প্রতারকাঃ'; ওদের কথা বিশ্বাস করো না।

এর উত্তর পাই শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, 'আমি বলছি বলেই মেনে নিবি না – নিজে যাচাই করে নিবি।' কেন বিশ্বাস করতে হবে কারো কথা মাত্রে? নিজে পরীক্ষা করে সত্য কি না দেখে নাও। রাম শ্যাম প্রভৃতি বলছেন 'ঈশ্বর আছেন'। যদু মধু প্রভৃতি বলছেন 'ঈশ্বর নেই। যারা ঈশ্বর আছে বলে তাদের কথা মিথ্যা।' বিশ্বাস যে কোন লোকের কথায় মানুষের হতে পারে, তাতে বলার কিছু নেই, বলে লাভও নেই। কিন্তু একজনের কথায় বিশ্বাস করে যখন কেউ বলে অপর আর একজনের কথা বিশ্বাস করা কুসংস্কার, তখন তার চেয়ে অযৌক্তিক কথা আর কি হতে পারে? আর, যখন অপরের পরীক্ষিত সত্যকে তার ঘোষিত পদ্ধতি ধরে চলে নিজে তার সত্যাসত্য যাচাই না করে দেখেই কেউ বলে 'এ সত্য নয়', তখন তার চেয়ে অবৈজ্ঞানিক কথাই বা আর কি থাকতে পারে? ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ঘোষিত পদ্ধতিতে পরীক্ষা না করেই, ল্যাবরেটরিতে না ঢুকেই যদি কেউ বলে 'বিজ্ঞানীদের কথা সব মিথ্যা' তার কথারও যা মূল্য, যুক্তির দিক থেকে এদের কথারও মূল্য তাই নয় কি?

এই সত্যটি, মাকালীকে সাক্ষাৎ দেখার পর (যার আগে ঈশ্বরীয় রূপ, শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শোনা তাঁর নিজের ঈশ্বরীয় দর্শনাদি তিনি বিশ্বাস করতেন না) স্বামীজীর কাছে স্পষ্ট হয়েছিলঃ শাস্ত্রে যে সব সত্যর কথা বলা হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজ অনুভূতি সম্বন্ধে যা সব বলেন, সে সবের সত্যতা সম্বন্ধে কোন মতামত দেবার অধিকার কারো আসে না, যতক্ষণ না ঘোষিত পদ্ধতি ধরে গিয়ে কেউ সেগুলির সত্যাসত্য নিজে পরীক্ষা করে দেখছে।

স্বামীজী যথার্থ যুক্তিবাদী ছিলেন। আমরা সাধারণতঃ যুক্তির দোহাই দিয়ে একটা কুসংস্কারকে ছেড়ে আর একটা কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরি – নিজে যাচাই করে না দেখেই যদুর কথায় 'বিশ্বাস' করে বলি রামের কথায় বিশ্বাস করা কুসংস্কার। এ বলার মূল্য কি?

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আবার স্মরণ করছি – যদি বিশ্বাস করা কুসংস্কার হয়, কারো কথা বিশ্বাস করো না, বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিসম্মত পথ ধরে চল – 'আমি বলছি বলে মেনে নিবি না-নিজে যাচাই করে নিবি।' ঈশ্বরকে আমি দেখেছি। যদি চাও তোমাকেও দেখাতে পারি।'

দ্বিতীয় সংশয়ের উত্তর স্বামীজীর কথায় বিস্তারিত ভাবে পাই বিভিন্ন প্রসঙ্গে, বিশেষ করে তাঁর লেখা 'রাজযোগ' গ্রন্থে – যে রাজযোগ সম্বন্ধে নিবেদিতা লিখেছেন, 'প্রাচ্যবাসীর কাছে রাজযোগ ধর্মগ্রন্থ হলেও পাশ্চাত্যবাসীর কাছে তা বিজ্ঞান'; যে রাজযোগ পড়ে টলস্টয় বলেছিলেন, এতে চিন্তা যে উচ্চ সীমায় পৌঁছেছে, পৃথিবীর অন্য কোন চিন্তাই সেখানে পৌঁছতে পারে নি; সত্য সম্বন্ধে নতুন আলোক লাভের জন্য যে রাজযোগের বক্তৃতা শুনতে আসতেন পাশ্চাত্যের কোন কোন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকও।

এ বিষয়ে স্বামীজীর বক্তব্য হল 'না',-আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার ধর্ম – জগতের মূল সত্যগুলির, বেদান্তের সত্যগুলির বিরোধী তো নয়ই, বরং সে সম্বন্ধে বৌদ্ধিক ধারণা যতটা করা যায় তা করতে সহায়কই। বেদান্ত মতে, একটি মূল সত্তা থেকেই বিশ্বের সব কিছুই – ইট, পাথর, জীবদেহ, জল, বাতাস, আলো প্রভৃতি অচেতন পদার্থ এবং মন, বুদ্ধি, প্রাণি-চেতনা প্রভৃতি সব কিছুই সৃষ্ট বা বিকশিত হয়েছে, বা বিকশিত বলে 'প্রতীত' হচ্ছে। সে সত্তাটি চেতন সত্তা। মনবুদ্ধি প্রভৃতির ভেতর দিয়ে সে চেতনার বিকাশ আমরা দেখি; যেগুলিকে অচেতন পদার্থ বলি, সেগুলির ভিতর তার প্রকাশ দেখতে পাই না। কিন্তু চেতন-অচেতন, স্থূল-সূক্ষ্ম সব কিছুতেই সেই চৈতন্য প্রচ্ছন্ন, ওতপ্রোত। এই মূল সত্তাকেই, ঈশ্বর প্রভৃতি বলা হয়। স্বামীজী বলেছেন, বিশ্ব ও জীবনের মূল সত্যের অন্বেষণে বিজ্ঞান এই একত্বের পথেই এগিয়ে চলেছে – 'একত্বের আবিষ্কার ব্যতীত বিজ্ঞান আর কিছুই নয়', সকল বিজ্ঞানকেই অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে।' বিজ্ঞানের আবিষ্কার একাত্মাভিমুখী দেখেই তিনি বলেছেন, 'হিন্দুরা যুগ যুগ ধরিয়া যে ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছে, সেই ভাব আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের নূতনতর আলোকে আরো জোরালো ভাষায় প্রচারিত হইবার উপক্রম দেখিয়া আমার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইতেছে।' স্বামীজী বলেছেন,

বেদান্ত সব ধর্মের বিজ্ঞানস্বরূপ, বেদান্তের আলোকে দেখলে সব ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বলতে পারি, তাই যদি হয়, তাহলে বিজ্ঞান জগৎ ও জীবনের মূলে কোন চেতন সত্তা না পেয়ে অচেতন একটা সত্তাকে (আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সত্যের ভিত্তিতে বলা যায়, অচেতন শক্তি বা এনার্জিকে, বিদ্যুত-চুম্বক-তরঙ্গকে) পাচ্ছে কেন? মন-বুদ্ধি-চেতনার বিকাশ প্রাণি দেহে দেখা গেলেও বিজ্ঞান এগুলিকে দেহাতিরিক্ত পৃথক সত্তা রূপে পাচ্ছে না কেন? বিজ্ঞানের কাছে এখনো এগুলি সত্তা নয়, গুণ মাত্র কেন?

উত্তরে বলা যায়, এখনো পাচ্ছে না বলে কখনো পেতে পারে না, একথাই বা বলি কি করে? বিজ্ঞান নিজে তা বলে না, বলতে পারে না। নিজ পদ্ধতিতে সুপরীক্ষিত সত্যকেই বিজ্ঞানীরা 'বৈজ্ঞানিক সত্য' বলে স্বীকার করেন; তার অতিরিক্ত যা কিছু বিজ্ঞানীদের যুক্তি-বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়, সেগুলি থিওরী বা আনুমানিক সত্যরূপে তাঁদের কাছে গ্রাহ্য - যতদিন না পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাঠামোয় সেগুলি ধরা পড়ে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁরা সত্যরূপে যা পেয়েছেন, তার পরে আর কিছু নাই, একথা কি বলেছেন কেউ? বরং উল্টোটাই বলেছেন তাঁরা, একটা সত্য আবিষ্কারের পরে তারও মূলে গভীরতর সত্যের ইঙ্গিত পাচ্ছেন।

আর, যত এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা ততই স্থূল থেকে সূক্ষ্মের, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর সত্তার দিকেই এগুচ্ছেন। এ চলা তো শেষ হয় নাই-'অ্যাটম অবিভাজ্য সত্য' - বিশ্বসৃষ্টির মূলে বিরানব্বইটা অ্যাটম রয়েছে - এইটাই একদিন বৈজ্ঞানিক সত্য ছিল। আজ আর অ্যাটম অবিভাজ্যও নয়, বিশ্বের মূল সত্তাও নয় - ইট, পাথর, জল প্রভৃতির মতোই মূল সত্তার একটা পরিণত অবস্থা মাত্র। অ্যাটম ভেঙ্গে ইলেকট্রন-প্রোটন পাওয়া গেছে, তার ভেতরও যে শক্তি ছাড়া আর কিছু নেই, সেগুলি যে শক্তিরই একটা পরিণত অবস্থা - এ ও স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য। অর্থাৎ যা কিছু আমরা দেখছি বা আছে বলে অনুমান করছি, তার সব কিছুর ভেতরই 'বস্তু' বা সত্তা খুঁজতে গেলে, কি দিয়ে সেটা তৈরী তা খুঁজতে গেলে, পরিণামে এই শক্তি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না- শক্তিই একমাত্র 'বস্তু', আর সব 'অবস্তু' অর্থাৎ বস্তু নয়, বস্তুর একটা অবস্থা মাত্র। যেমন হাইড্রোজেন অ্যাটম একটা ইলেকট্রন ও একটা প্রোটনের বিশেষ অবস্থান মাত্র, যেমন জলের একটা মলিকিউল, দুটো হাইড্রোজেন ও একটা অক্সিজেন অ্যাটমের বিশেষ অবস্থান মাত্র। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, 'স্থূলের কারণ সব সময়

সূক্ষ্ম' – ধর্মশাস্ত্রের এ সত্যটি উল্লেখ করা ছাড়াও আইনস্টাইনের ল–অব–রিলেটিভিটি–ভিত্তিক ফরমুলা $E=mc^2$ ঘোষিত হবার (১৯০৫ খৃঃ) পূর্বেই স্বামীজী বলেছেন যে, শক্তিই জড়ের কারণ– জড় শক্তিরই পরিণত অবস্থা – এটা প্রমাণ করা সম্ভব।

কাজেই, 'শক্তিই এই জগৎ রূপে প্রতিভাত হচ্ছে, জগৎটা শক্তিরই খেলা– শক্তির খেলাতেই জাগতিক সব বস্তুর সৃষ্টি–স্থিতি–বিনাশ চলছে– এইটা আজ আর শুধু ধর্মশাস্ত্রের কথা নয়, বিজ্ঞানেরও কথা; প্রভেদ শুধু, শাস্ত্র বলছে, এই শক্তি চৈতন্যময়ী এবং তারও পরের সত্য হল চৈতন্যই এই শক্তিরও কারণ– একটি চেতন সত্তাই শক্তিরূপে প্রতিভাত। এটা সত্য হতে পারে না, একথা বিজ্ঞান বলতে পারে না। বরং বিজ্ঞানের সত্যান্বেষণের প্রচেষ্টায় সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর সত্তার সন্ধান দিন দিন পাওয়া যাচ্ছে দেখে যুক্তির দৃষ্টিতে এর অসত্যতার চেয়ে সত্যতার সম্ভাবনাই অধিক প্রকট হয়।

মন, বুদ্ধি ও চেতনা, অচেতন শক্তি ও জড়পদার্থের একটা বিশেষ অবস্থানে যার বিকাশ ঘটে বলে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞান ভাবে, যেগুলির দেহাতীত পৃথক সত্তারূপে অবস্থানের সন্ধান বিজ্ঞান এখনো পায় নাই,–সে সম্বন্ধে স্বামীজী যে যুক্তি দেখিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের কি বলার আছে জানিনা। স্বামীজী বলেছেন, মন বুদ্ধি ও চেতনা যদি বস্তুর ভেতর প্রচ্ছন্ন না থাকতো, তাহলে বস্তুর যে কোন অবস্থানেই হোক তার ভেতর থেকে সেগুলির বিকাশ সম্ভব হয় কি করে? জলের ভেতর হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন প্রচ্ছন্ন আছে বলেই জল থেকে এক বিশেষ অবস্থায় সেগুলির বিকাশ সম্ভব।[১] অ্যাটমের ভেতর ইলেকট্রন প্রোটন প্রভৃতি, এবং তারও ভেতর শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে বলেই সে সবের ভেতর থেকে শক্তির বিকাশ সম্ভব। মন বুদ্ধি চেতনা যদি বস্তুর ভেতর প্রচ্ছন্ন না থাকতো, তাহলে কোন অবস্থাতেই তার ভেতর থেকে এগুলির বিকাশ সম্ভব হত না।

---

১. অ্যাটমের কেন্দ্রে এক বা একাধিক প্রোটন ও নিউট্রন থাকে, এবং তার চারিদিকে কেন্দ্রস্থ প্রোটনের সমসংখ্যক ইলেকট্রন কণা প্রচন্ডবেগে ঘোরে। অ্যাটমের কেন্দ্রস্থ প্রোটনের সংখ্যার তারতম্যেই অ্যাটমের গুণের তারতম্য ঘটে, বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হয়; নিউট্রনের সংখ্যা তার ওজন বাড়ায় মাত্র। এছাড়া, পজিট্রন, মেশন প্রভৃতি আরো কয়েকটি কণার অস্তিত্বেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন বিজ্ঞানী আজ গভীরতর রহস্যের ইঙ্গিত পাচ্ছেন প্রোটন–কণার মধ্যে।

এটা বলেছেন, যুক্তির দিক থেকে। যুক্তির দিক থেকে বহু বৈজ্ঞানিকও একথা 'অনুমান' করে গেছেন, আমরা জানি। নিউটন বিশ্বের মূলে বিরাট বুদ্ধির এবং আর্থার এডিংটন, জেমস্ জীন বিরাট মনের অস্তিত্ব অনুমান করেছেন।

যুক্তির দিক থেকে বলা ছাড়া স্বামীজী নিজের ও অন্যান্য সত্যদ্রষ্টাদের এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কথা তো বলেছেনই। বলেছেন, জড়বাদী হলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে, এই জগৎটা একটা জড়ের সমুদ্র; আমাদের দেহ, জাগতিক বস্তু, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা সবাই সে সমুদ্রের মধ্যে যেন এক একটা ঘূর্ণিমাত্র। কতগুলো জড়কণা কোথাও কোথাও দানা বাঁধছে কিছুক্ষণের জন্য। আবার দানা খুলে জড় সমুদ্রে মিশে যাছে। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও জগতটা তাই। যদি আমাদের ইলেকট্রন প্রভৃতি কণাগুলি 'দেখা'র শক্তি থাকতো, তাহলে আমরা বহুরূপগুণ বিশিষ্ট জাগতিক বস্তু আর দেখতে পেতাম না, দেখতাম কতকগুলো একই জাতীয় কণার একটি সমুদ্র - স্থানে স্থানে কণাগুলি বিভিন্ন সংখ্যায় ও বিভিন্নভাবে দানা পাকিয়ে রয়েছে মাত্র। শক্তি-তরঙ্গ দেখার শক্তি থাকলে এই কণাগুলিও আর দেখতে পেতাম না, জগৎটকে শক্তি-তরঙ্গময় সমুদ্ররূপে দেখতাম। এই শক্তি বা কণা-সমুদ্রে বিভিন্ন বস্তু দেখাটা সত্যকে প্রত্যক্ষ করা নয়, আপেক্ষিক সত্যকে দেখা মাত্র, 'প্রতীতি' মাত্র। যেমন স্বামীজী বলেছেন, একটা আলোকবিন্দু ঘুরছে, ঘোরার বেগ একটা সীমা ছাড়িয়ে যাবার পর আমরা আলোকবিন্দুটিকে বা তার ঘূর্ণনকে আর দেখতে পাই না, 'দেখি' একটা আলোকবৃত্ত সামনে রয়েছে। অথচ, সত্য হল, একটা আলোক বিন্দু ঘুরছে। আলোকবৃত্তটার বাস্তব কোন সত্তা নেই, সেটা একটা প্রতীতি মাত্র। অথচ দেখছি সেটি ইট, পাথর, মলিকিউল অ্যাটম, ইলেকট্রন প্রভৃতি সবই ঠিক এমনি প্রতীতি, সত্য হল শক্তি-তরঙ্গ। আবার এক সঙ্গে দুটোকেই আমরা দেখতে পাই না। যখন আলোকবৃত্ত দেখি তখন ঘূর্ণমান আলোকবিন্দুটিকে দেখতে পাই না, যখন বিন্দুটিকে দেখতে পাই, তখন আলোকবৃত্ত থাকে না।

তেমনি জগতটাকে জড়সমুদ্ররূপে দেখাটাও একটা প্রতীতি। বস্তুর আরো সূক্ষ্ম অবস্থা প্রত্যক্ষ করার শক্তি থাকলে এই জগতটাকে একটা মনের-চিন্তার-ভাবের সমুদ্ররূপে দেখা যায়। প্রত্যক্ষের শক্তি আরো বাড়লে চৈতন্যের সমুদ্ররূপে দেখা যায়। এই চৈতন্যসত্তাই বিশ্বের, জীবনের মূল কারণ; এঁকেই ঈশ্বর প্রভৃতি বলা হয়।

আমরা আগেই বলেছি, এ সত্য প্রত্যক্ষ করা যায়, সত্যদ্রষ্টারা প্রত্যক্ষ করেছেন, প্রত্যক্ষ করার পদ্ধতি-সাধন পদ্ধতি-বলে গেছেন। এক চৈতন্য-সত্তাই

চেতন শক্তি রূপে- ঈশ্বররূপে প্রতীত হচ্ছেন-একথা সত্যদ্রষ্টারা নিজ প্রত্যক্ষ থেকেই বলেছেন, বুদ্ধি দিয়ে অনুমান করে নয়। যেমন, শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'দেখছি, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন, বিচার আর কি করবো!' যুক্তির আলোকে বুদ্ধিতে যতটা ধারণা করা সম্ভব, স্বামীজী যুক্তির আলোকপাত করে ততখানিই দেখিয়েছেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান এর বিরুদ্ধে তো যায়ই না বরং এ সত্য ধারণা করতে সহায়তাই করে।

কাজেই বিজ্ঞান জড়বাদ সমর্থন করে একথা বলা চলে না; জড়বাদীরাই বলে বিজ্ঞান জড়বাদের সমর্থক। একজন বিজ্ঞানীর, আঁদ্রের কথাই উদ্ধৃত করছিঃ 'ডায়েলেকটিক্যাল বা অন্য কোন ধরণের জড়বাদ হল এক ধরণের মতবাদ, পক্ষানুরাগ ও বিশ্বাসের ওপর যা স্থাপিত; এক ধরণের লোকের মনে এর আবেদন রয়েছে, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার বা আবিষ্কর্তাদের পক্ষ থেকে এর কোন সমর্থন নেই।।'

বিজ্ঞানই জগতের সব সমস্যার সমাধান করবে, তার জন্য ঈশ্বর বা ধর্মকে টেনে আনবার দরকার নেই, এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর যে সাবধানবাণী মনে জাগে, জড়বাদের ভিত্তি থেকে সরিয়ে আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির ওপর স্থাপিত না করলে পাশ্চাত্যসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে- সে বাণীরই প্রতিধ্বনি আজ শোনা যাচ্ছে একজন আধুনিক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবীর কণ্ঠে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি বলেছেন যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি মানুষের হাতে বিপুল বিধ্বংসী শক্তি তুলে দিয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন দেশের মানুষকে পরস্পরকে ভালবাসতে শেখায় নি। 'মানবেতিহাসের এই চরম বিপজ্জনক মুহূর্তে ভারতীয় জীবন পন্থাই মানব জাতির মুক্তির একমাত্র পথ।...এই পারমাণবিক যুগে আমাদের আত্মঘাতী হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র পথ।' আরও বড় কথা বলেছেন, শুধু বাঁচার তাগিদেই যে ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাস ভিত্তিক এই পথ গ্রহণ করতে হবে তা নয়, 'রামকৃষ্ণ গান্ধী ও অশোকের উপদেশে গভীরভাবে আকৃষ্ট হতে ও তদনুসারে চলতে হবে, -তাঁদের উপদেশ গ্রহণের কারণরূপে এটা গৌণ। এর মুখ্য কারণ হল- এ উপদেশ সত্য; সত্য, কারণ তা আধ্যাত্মিক সত্যের যথার্থ-উপলব্ধি-প্রসূত।'

ঈশ্বরাস্তিত্বের বিরুদ্ধে তৃতীয় সংশয় বা প্রচারিত যুক্তি হল, জগৎকারণ ঈশ্বর সম্বন্ধে এক এক ধর্ম এক এক রকম বর্ণনা দিচ্ছে। হিন্দুরা একরকম, মুসলমানরা একরকম, খৃষ্টানরা একরকম ইত্যাদি। যা সত্য, তা তো আর দু'রকম হতে পারে না, কাজেই সব ধর্ম অসত্য, ঈশ্বর অসত্য।

এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সব ধর্ম মতে সাধন করে নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকেই বলেছেন, সব ধর্মই সত্য; 'যত মত তত পথ'; 'মত ধর্ম নয়, ধর্মলাভের উপায়, পথ।' স্বামীজী বলেছেন, অনুভূতিই ধর্ম। এবং সে অনুভূতি– জগতের মূল কারণের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। সব ধর্মেই সত্য এক, ভিন্ন ভিন্ন নয়ঃ 'সকল ধর্মের জ্ঞানাতীত বা তুরীয় অবস্থা এক। দেহজ্ঞান অতিক্রম করলে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, এমন কি যারা কোন প্রকার ধর্মমত স্বীকার করে না, সকলেরই ঠিক একই প্রকার অনুভূতি হয়ে থাকে।'

তাহলে বিভিন্ন ধর্মাচার্যগণ তাঁকে বিভিন্নরূপে প্রচার করেন কেন? সবাই তাকে জ্ঞানাতীত, মনবুদ্ধির অতীত নির্গুণ নিরাকার বললেই তো পারতেন, তা না বলে বিভিন্নরূপ কেন বলেছেন! এর উত্তর, মন বুদ্ধি দিয়ে ধরা য়ায়, এমন একটা অবলম্বন ছাড়া সে সত্যলাভের দিকে এগিয়ে যাবার লোক কজন? তাই অবতার বা আচার্যগণ সেই অদ্বয় বাক্যমনাতীত সত্যকেই একটা 'তত্ত্ব' রূপে দেশকালোপযোগী মনবুদ্ধির ধরা ছোঁয়ার মত রূপে, উপস্থাপিত করেন। 'তিনি কৃষ্ণ', 'তিনি কালী', 'তিনি সচ্চিদানন্দ' তিনি সগুণ নিরাকার ব্রহ্ম, গড আল্লা– এসবই 'তত্ত্ব'– আমাদের চিন্তার আবরণে আবৃত সত্যের এক একটা আকার মাত্র। 'অবতারেরা পুনঃ পুনঃ এসে আমাদের মূল তত্ত্বটি বুঝিয়ে দিয়ে যান। আর সেই কালের উপযোগী তার একটা নতুন আকার দিয়ে যান। আমার গুরুদেব বলতেনঃ ধর্ম এক। সকল অবতারকল্প পুরুষ একরকম শিক্ষাই দিয়ে যান, তবে সকলকেই সেই তত্ত্বটি প্রকাশ করতে কোন না কোন আকার দিতে হয়। সেইজন্য তাঁরা তাকে পুরাতন আকার থেকে তুলে নিয়ে নতুন আকারে আমাদের সামনে ধরেন।'

এই 'আকার' অবলম্বনে, ঈশ্বর সম্বন্ধে যে কোন ধর্মের যে কোন ধারণা অবলম্বনে যখন নামরূপের, মনবুদ্ধির পারে গিয়ে মূল সত্যের মুখোমুখি হওয়া যায়, তখন আগেই উদ্ধৃতি দিয়েছি, সব ধর্ম মতের লোকেরই , এমন কি ঈশ্বর– বিশ্বাস ছাড়াও যদি কেউ সেখানে যেতে পারেন তাঁরও একই রকম প্রত্যক্ষ হবে।

এই প্রত্যক্ষের সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়িয়েই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন যে, যিনি ব্রহ্ম তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই কালী, তিনিই গড, তিনিই আল্লা প্রভৃতি।

বেদান্ত দর্শন বা যে কোন ভারতীয় দর্শনে যুক্তির স্থান হল প্রত্যক্ষ করা সত্যকে অপরের মনবুদ্ধির স্তরে, ধারণায়, নিঃসংশয় করার জন্য; পাশ্চাত্য দর্শনের মতো যুক্তির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য নয়।

বেদান্ত দর্শন বা যে কোন ভারতীয় দর্শনে যুক্তির স্থান হল প্রত্যক্ষ করা সত্য কে অপরের মনবুদ্ধির স্তরে, ধারণায় নিঃসংশয় করার জন্য; পাশ্চাত্য দর্শনের মতো যুক্তির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য নয়। যুক্তি তো যেতেই পারে না সেখানে।

ঈশ্বর আছেন, তাঁকে দেখা যায়; সবধর্মই সত্য- একই চরম সত্তা বিভিন্ন ধর্মে বর্ণিত; হাজার হাজার বছর আগে আবিষ্কৃত অধ্যাত্মসত্যগুলির সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সত্যগুলির নিজ সীমা পর্যন্ত কোন বিরোধই নেই, বরং সে সীমার অতীত সত্যকে ধারণা করতেও তা সহায়ক; ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু- এ সবই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি সঞ্জাত সত্যেরই বিবৃতি। সেখানে স্বামীজী যুক্তি যা দিয়েছেন, সে শুধু আমাদের মনবুদ্ধির পক্ষে সেই উপলব্ধি সিদ্ধান্তগুলিকে ধারণা করা সহজ হবে বলে। সে যুক্তির আলোকে যুক্তাভ্যাসগুলিকে স্পষ্ট চেনা যায়, আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যগুলির মধ্যে ঈশ্বরাস্তিত্বের বা শাস্ত্রোক্ত অধ্যাত্ম সত্যগুলির বিরোধী কিছুই দেখা যায় না।

সাইবাবার অলৌকিকত্ব **ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য**

মাত্র ষোল বছর বয়স ফকিরের। পরণে সাধারণ এক ময়লা বেশবাস। বিভিন্ন স্থান ঘুরতে ঘুরতে একসময় আমেদাবাদ জেলার শিরডি গ্রামে আসেন তিনি।

প্রথমে ঐ গ্রামের এক নিমগাছের তলায় আশ্রয় নেন। পরে একটা মসজিদে এসে ওঠেন। ঐ মসজিদে কয়েকটি উদাসী ও সংসার ত্যাগী মানুষ বসবাস করত। তাদের সঙ্গে ফকির সাহেব ধর্মপ্রসঙ্গ নিয়ে মাঝে মাঝে আলাপ আলোচনা করেন।

মাঝে মাঝে কয়েকটি সংসারী মানুষ এসে ঐ মসজিদে বসে ফকির সাহেবের মুখে বিচিত্র এবং সুন্দর ধর্মকথা শোনে। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায়। তবু তারা সেই স্থান ত্যাগ করে না। তন্ময় হয়ে শোনে ফকিরের মুখে অপূর্ব ধর্মামৃত – প্রেমময় ঈশ্বরের অশ্রুতপূর্ব লীলাগাথা।

আলোচনা গভীর রাত পর্যন্ত চলে। তার মধ্যে অনেকে গাঁজার নেশাও করে। কিন্তু তাতে আলোচনায় ছেদ পড়ে না। আলোচনা যথারীতি চলতে থাকে। মোট কথা কোন অসুবিধা আলোচনাকে পণ্ড হতে দেয় না।

সেদিন রাতে এমনিধারা ধর্ম-আলোচনায় তন্ময় হয়েছেন ফকির সাহেব। স্থানীয় ও আগন্তুক শ্রোতারা তাঁকে ঘিরে বসেছে। তন্ময় চিত্তে শুনছে ফকির সাহেবের কথামৃত। বিভিন্ন জায়গায় সাধু সন্তদের জীবন কাহিনী থেকে আরম্ভ করে নানা শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ নিয়ে গল্প ও আলোচনা করতে লাগলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা মনে রইলো না। রাতও গভীর হতে গভীরতর হয়ে উঠলো। ঘরের এককোণে ভাঙ্গা লন্ঠনটি টিমটিম করে জ্বলছে। তার তেল ফুরিয়ে এসেছে। একটু পরেই নিভে যাবে। কিন্তু ফকির সাহেব বা তাঁর অনুরাগীদের সেদিকে কোন হুঁশ নেই। তাঁরা একাগ্রচিত্তে ধর্ম প্রসঙ্গ নিয়ে মেতে আছেন।

একসময় আলো নিবু নিবু অবস্থায় এসেছে। হঠাৎ ফকির সাহেব উঠে গিয়ে নিকটবর্তী লোটা থেকে জল নিয়ে লন্ঠনের মধ্যে ঢেলে দিলেন। অমনি আলোর শিখা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এইভাবে যতবার আলোর শিখা নিবে যাবার উপক্রম হতে লাগল, ততবারই ফকির সাহেব ধর্মালোচনার ফাঁকে ফাঁকে উঠে গিয়ে লন্ঠনের মধ্যে লোটার জল ঢেলে দিতে লাগলেন।

এভাবে রাত পুইয়ে গেল। ভোরের আলো প্রকাশ হল চারদিকে। তখন যে যার সব বাড়ি ফিরে গেল। কিন্তু সকলের মনে কৌতূহল জেগে রইলো ফকির সাহেবের অলৌকিক কাণ্ড লক্ষ্য করে। তিনি লন্ঠনের তেল ফুরিয়ে গেলে জল ঢেলে তার আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন। এ বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়।

ক্রমে ফকির সাহেবের এই প্রকার অলৌকিক ক্ষমতার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। বহু লোক দলে দলে এসে তাঁর কৃপাকণা লাভ করবার জন্যে ব্যাগ্র হল।

ফকির সাহেবও তাঁদের মঙ্গলের জন্য অকাতরে তাঁর কৃপাকণা বিতরণ করে যেতে লাগলেন। কালে তিনি সকলের কাছে বিখ্যাত সিদ্ধ পুরুষ সাইবাবা নামে পরিচিত হলেন এবং দিনের পর দিন তাঁর অলৌকিক বিভূতির প্রকাশও ঘটতে লাগল।

সিপাই বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত অন্যতম বিদ্রোহী এবং বিপ্লবী নানাসাহেব ছিলেন সাইবাবার একান্ত অনুগত ভক্ত। নানা সাহেবের আসল নাম হচ্ছে নারায়ণ গোবিন্দ চন্দোরকার। তিনি সম্ভ্রান্ত ও ধর্মনিষ্ঠ মারাঠী ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ

করেন। সরকারী কাজে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে নিজের মেধা ও স্মৃতিশক্তির বলে রাজস্ব বিভাগের এক উচ্চ পদ অধিকার করেন।

কি একটা কাজে একবার নানাসাহেব তাঁর জনৈক সঙ্গীর সঙ্গে গেছেন হরিশ্চন্দ্র পাহাড়ে। তখন গরম কাল। রুক্ষ পাথরে ঢাকা এই পাহাড়ী অঞ্চলে এমনিই জল সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার। তার উপর আবার পানীয় জল!

ওদিকে ভয়ানক তৃষ্ণা পেয়েছে নানাসাহেবের। ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম হল। সঙ্গের সাথীটি এদিক-ওদিক অনেক চেষ্টা করেও জল সংগ্রহ করতে পারলে না। জল না পেয়ে হতাশ হয়ে উভয়ে বসে আছেন। এমন সময় তাঁদের কাছে এল এক পাহাড়ী ভীল।

তাকে দেখতে পেয়ে ব্যগ্র হয়ে বললেন নানাসাহেব, ভাই, তৃষ্ণায় যে মরে যাচ্ছি। এখানে কোথায় একটু জল পাওয়া যাবে বলতে পারো?

ভীল হেসে বললে, তুমি যে জন্য চারিদিকে ছটফটিয়ে বেড়াচ্ছ সে যে রয়েছে তোমার বসবার জন্য পাতা ঐ পাথরের তলায়। ওটা একটু সরিয়ে দেখ না!

ভীলের কথা শুনে উভয়ে পাথরটি সরিয়ে দেখলেন। তারপর যে দৃশ্য তাঁরা দেখতে পেলেন, তাই দেখে অবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন এক ক্ষীণকায়া পাহাড়ী ঝরণা ঝির ঝির করে বয়ে যাচ্ছে। অঞ্জলিভরে তার জল পান করার পর তৃপ্ত হলেন নানাসাহেব এবং তাঁর প্রিয় সঙ্গীটি।

এই ঘটনার বেশ কয়েকদিন পরে শিরডিতে এসেছেন নানাসাহেব। তাঁকে দেখামাত্র সাইবাবা স্মিতহাস্যে বলতে লাগলেন, কি হে নানা, তৃষ্ণার সময় পাহাড়ে সেদিন জল তো মিলেছিল? দ্যাখো! ভগবানের কৃপা থাকলে পাথরের ভেতর থেকেও জল বেরয়। তার জন্যে পরিশ্রম করে আর কূয়ো খুঁড়তে হয়না।

সামনে বসা ভক্তরা জানালে, কিছুদিন আগে এক দুপুর বেলায় বাবা হঠাৎ বারবার বলছিলেন, তাইতো! কি করা যায় বলত? আমাদের নানা যে তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছে।

ভক্তেরা সেদিন তাঁর এই কথার মর্ম বুঝতে পারেন নি। এ রহস্যময় কথা শুনে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। এবার নানাসাহেবের কাছে সমস্ত কথা শোনার পর বাবার সেই কথার মর্ম উদ্ধার করলেন।

সাইবাবার অলৌকিক বিভূতির বলে কত নিঃসন্তানবতী নারী সন্তান-সম্ভবা হয়েছে। শান্তারাম বলবন্তনাচনের স্ত্রী একবার সাইবাবার বিশেষ কৃপা পেয়ে একটি শিশু লাভ করে। পুত্রের জন্মের কিছুকাল পরেই মা মারা যায়। ঐ শিশুর

নাম রাখা হল কালুরাম। শিশুর যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়স তখন থেকে তার মধ্যে প্রকাশ হতে থাকে আধ্যাত্মিক ভাবসকল।

ভোর না হতেই কালুরাম ঘরের এক কোণে একান্তে উপবেশন করে, শিবনেত্র হয়ে ধ্যানের গভীরে সে ডুবে যায়। ধ্যান শেষ হলে ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো সাইবাবার আলোক চিত্রটির আরতি করে তার সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানায়। দিনের বাকী সময়টুকু 'রাম, হরি নাম' গেয়ে কাটিয়ে দেয়।

ঐ অল্প বয়সে তার দেহে নানাপ্রকার সাত্বিক ভাব দেখা গেল। দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময় সে সাধনভজনে কাটিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে তার মুখে কৃষ্ণজীর দর্শনের অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়। সেই সকল কাহিনী শোনার পর তার আত্মীয় স্বজন অবাক হয়ে যায়।

দিনে দিনে কালুরামের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাই গাড়ডি বাবা নামে এক বিশিষ্ট আচার্য সে'বার এই শিশু সাধককে দেখতে এলেন। সব কিছু দেখে ক্রুদ্ধ হলেন গাড়ডি বাবা। শান্তারাম নাচনেকে ডেকে তিরস্কার করে বললেন, তোমার একি অদ্ভূত মনোবৃত্তি বল তো? এই ছোট শিশুটিকে শেষে কিনা এক মুসলমান ফকিরের উপাসনা শেখাচ্ছো!

অমনি শিশু কালুরাম সেই কথার পিঠে এককথায় উত্তর দেয়। তার হাতে ছিল গ্রামোফোন কোম্পানির এক বিজ্ঞপ্তি পত্র। তাতে ছিল গ্রামোফোনের চোঙের সামনে ধ্বনি শ্রবণে উন্মুখ এক কুকুরের ছবি।

কালুরাম সেই ছবি ধরে বললে, পণ্ডিতজী, এই কুকুরের মতন এমনি করেই রোজ নিবিষ্ট হয়ে সাইবাবার ফটোর কাছে আমি বসি, আর তাঁর কথা শুনি।

কালুরামের কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেন গাড়ডি বাবা। তিনি তাঁকে বললেন, আচ্ছা, কি করে তাঁর কথাবার্তা তুমি শোনো আমাদের তা বল তো।

কালুরাম বললে, একথা বলে বোঝানো যায় না, বুঝে নিতে হয়। গাড় ডি বাবা ক্রমে শিশুর কথা উপলব্ধি করলেন।

এই শিশুকে বেশিদিন দেহ ধারণ করতে হল না। কয়েক বছর বাদে সে মারা যায়। মরবার সময় সে পিতার মুখে গীতার ভাষ্য 'জ্ঞানেশ্বরী' শুনতে শুনতে অমরধামে প্রস্থান করে।

সাইবাবার অলৌকিক বিভূতির আর অন্ত নেই। ভীমাজী পৈচেলের বাড়ী পুণা জেলার জুন্মের গ্রামে। সে নিদারুণ যক্ষ্মা ও অগ্নিমান্দ্য রোগে ভুগে শরীরটা একেবারে জীর্ণ শীর্ণ করে ফেলেছে। নানা জায়গায় বৈদ্য দেখিয়েছে, নানা

দেবস্থানে মানত করেছে। কিন্তু কিছুতেই সে ব্যাধিমুক্ত হতে পারছে না। ডাক্তাররা তাকে জবাব দিয়ে দিয়েছে।

তাই হতাশায় ম্রিয়মান হয়ে ভীমাজী মৃত্যুর দিন গুনছে।তার কাছে জীবনে বেঁচে থাকার আনন্দ ম্লান হয়ে গেছে। রাতদিন সে বিমর্ষ হয়ে বসে থাকে আর নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে।

একদিন তার জনৈক হিতৈষী তাকে উপদেশের সুরে বললে, ভীম, তুমি এত ভাবছ কেন? অমন করে মন খারাপ করে বসে থেক না। তোমার মন খারাপের কারণ বলো গিয়ে শিরডির সাইবাবাকে। তিনি তোমার সমস্ত দুঃখ নাশ করে দেবেন তাঁর অলৌকিক বিভূতির স্পর্শে। তখন দেখবে তুমি মানসিক শান্তি ফিরে পেয়েছ। বাবার শক্তি অনেক। তিনি যেন সাক্ষাৎ ভগবান। তুমি একবার তাঁর কাছে যাও।

হিতৈষীর কথা শুনে মনে-প্রাণে উৎসাহ বোধ করল ভীমাজী। সে রোগ যন্ত্রণা ভোগ করে চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়েছে। তাই সে একটা টাঙ্গায় চেপে সাইবাবার কাছে এলো।

সাইবাবা ভীমাজীকে দেখেই রাগে অগ্নিশর্মা হলেন। চীৎকার করে বলতে থাকলেন, ওরে, এ চোরটাকে এখানে কে টেনে আনলে? দ্যাখতো, আমায় আবার কি এক দায়িত্বের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে।

ভীমাজী অত্যন্ত অসুস্থ। কোন রকমে ধুঁকতে ধুঁকতে এসে সাইবাবার শয্যাপাশে এসে বসলো। সাইবাবার শ্রীচরণে তার মাথাটি রেখে কাতর স্বরে বলল, বাবা, শুনেছি আপনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। আমার মত আশ্রয়হীন দুর্ভাগা আর কে আছে? আপনি আমায় কৃপা করুন।

ভীমাজীর আকুল আহবানে দয়ালু ফকির সাহেবের অন্তর করুণার জাহ্নবী ধারায় দ্রব হয়ে গেল। শান্ত ও গম্ভীর কন্ঠে বলে উঠলেন ভীমাজীকে লক্ষ্য করে, তোমার কথা জানি বাবা। তুমি চুপ করে বসে থাক। কোন দুশ্চিন্তা নেই। তোমার প্রারব্ধের কর্মভোগ এবার শেষ হয়ে এসেছে। শিরডির মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে এমনটি হয়েছে। ঈশ্বর এবার তোমার দুর্গতি ঘুচিয়ে দেবেন।

এই বলে সাইবাবা ধুনি থেকে খানিকটা উর্ষি তুলে নিয়ে ভীমাজীর মাথায় মাখিয়ে দিলেন।

আশ্চর্য ব্যাপার! উর্ষি মাখায় মাখার সঙ্গে সঙ্গে ভীমাজী নিজেকে যেন সুস্থ-সবল বোধ করলো। মৃতকল্প ন্যুব্জ দেহ বেশ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

তার দেহে রোগের কোন চিহ্ন নেই। নেই আগের মত রোগ যন্ত্রণার দুঃসহ জ্বালা এবং কাতরতা।

উপস্থিত সকলে সাইবাবার অলৌকিক বিভূতি লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেল।

নমনীয়তা **শ্রী দীপঙ্কর নন্দী**

সবসময় সব সত্যি বলতে নেই।
একটু মেনে নিতে – মানিয়ে নিতে শিখুন।
দেখছেন না চারপাশে সবাই কেমন
মেরুদণ্ড ঈষৎ ঝুঁকিয়ে হাঁটছে,
এটাকে নমনীয়তা বলে – বুঝতে শিখুন।
মুখের উপর সোজাসাপটা বললে
আজকাল বিপদ বাড়ে বই কমে না –
দেখছেন না, সাক্ষীদেরও ভাড়া করা যায় –
শান্তি এখন কিনতে পাওয়া যায় –
পাড়ায় চাঁদা দিন, অফিসে বসকে তেল দিন
প্রতিবেশী আর বন্ধুদের যে কোন ছুতোয়
নেমন্তন্ন করে নিজের খরচে খাইয়ে দিন।
নেতা মন্ত্রীদের কৃপা পেতে চামচেদের ঘুষ দিন -
পারলে সত্যিকে মিথ্যে বলুন-
মিথ্যেকে সত্যি বলতে শিখুন,
কারণে – অকারণে হেঁ-হেঁ মার্কা হাসি
ঝুলিয়ে হাত কচলাতে শিখুন –
তাহলে আপনার মাথা যে কোন দিকে
যখন তখন হেলতে থাকবে আর
মেরুদণ্ড আপনা-আপনি ঈষৎ ঝুঁকে যাবে।

তখন আর আপনাকে পায় কে?

DONT COPY

ভেসে যাওয়া **শ্রী প্রকাশ অধিকারী**

লোকটা মিথ্যে কথা বললো ----
আগের মিথ্যেটা ঢাকতে।
আগে মিথ্যে বলেছিল বলে
এবারেও মিথ্যে বলতে হলো তাকে .....

এমনি করেই মিথ্যেকে
সংক্রামিত করেছে সে অবহেলে
চারিপাশে।

কি দরকার ছিল অপ্রয়োজনীয়
সব মিথ্যের বেসাতি ---
যখন জীবনটাই যায়
মিথ্যের স্রোতে ভেসে ...

আমাদের এই দেশে।

অমরত্ব **সুনন্দন ঘোষ**

চেনা মুখগুলো ভুলে যাচ্ছি আস্তে আস্তে।
অচেনা হয়ে যাচ্ছে সময়।
মুখোশের আড়ালে
একটা একটা করে কেটে যাচ্ছে দিন মাস বছর।
আমাদের এপার্টমেন্টের পাঁচজন মানুষ এখন স্মৃতির খাতায়।
দেবানন্দ, পার্থ, অমৃত, মৃদুল – কলেজের বন্ধুরা, অফিসের সঙ্গীরা
কে কখন ঝরে যাচ্ছে শুকনো পাতার মতো –
ছিঁড়ে যাচ্ছে জীবনের যোগসূত্রগুলো!

একদল কোভিডের চিকিৎসা নিয়ে জমিয়ে ব্যবসা করছে,
একদল তুলছে নীতিহীন রাজনীতির ফসল,
আর বিত্তহীন ঘরের ছেলেমেয়েরা মরছে সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

DO NOT COPY

ভারতে এখন কোভিডে মৃত্যুর হার এক শতাংশ।
আমার তো চেনা কোন জ্যোতিষী নেই যে বলে দেবে
আমি ৯৯-এ থাকছি এখন, নাকি ১-এ।
রোজ সকালেই মনে হয়
এই বুঝি হাঁচি শুরু হল, গলাটা কি একটু ব্যথা ব্যথা করছে,
কপালটা গরম নাকি?
রাতে শোয়ার আগে জোড়হাতে ঠাকুরের ছবিতে প্রণাম করি,
আরেকটা দিন কাটালাম ৯৯ শতাংশের দলে।

রেসের মাঠে যেমন ঘোড়ায় বাজী লাগায় রেসুড়েরা,
আমরা একদল টিপিকাল মধ্যবিত্ত
প্রতিদিন প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ঢেউ গুণতে গুণতে
লকডাউনের রাজনীতি হিসেব করতে করতে
জীবন মৃত্যুর মাদারীর খেলা খেলতে খেলতে
বসে যাচ্ছি গুগল ম্যাপ নিয়ে।

গত বছর খোলা-বন্ধের ফাঁকে উপভোগ করেছি অরুণাচল,
তার আগের বছর লকডাউনের টাইম টেবিলের সাথে
চোর-পুলিশ খেলে ঘুরেছি উত্তরবঙ্গ,
এবার কোথায়?
লাদাখ? মেঘালয়? এভারেস্ট বেস ক্যাম্প?

এভাবেই বেঁচে থাকব।
শরীরতো ছাই হবেই আজ বা কাল।
উত্তরাধিকার থেকে যাবে অনাগত প্রজন্মে।
মাঝপথে আমার নামিয়ে রাখা রুকস্যাক তুলে নেবে
একজন কিশোর বা এক তরুণী,
পৌঁছে দেবে অনামী শিখরে
যেখানে অপেক্ষা করছে আমার স্বপ্ন।

DO NOT COPY